প্রস্তাবনা

উত্তরবঙ্গের উপজাতিদের মধ্যে কতগুলি সাধারন লক্ষন দেখা যায়। সেগুলি হোলো:-

(ক) এরা প্রায় সব সময়ই একটা নির্দিষ্ট এলাকায় গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বাস করে এবং আশেপাশের সমাজের লোকেদের সংগে মেলামেলা করে। কিন্তু নিজেদের প্রচলিত নিয়মকানুন মেনে চলে। প্রতিবেশীদের সংগে এদের ব্যবহার বন্ধুত্বপূর্ন।

(খ) এই উপজাতিদের প্রত্যেকেরই নিজেদের আলাদা ভাষা রয়েছে। কিন্তু কাগজেকলমে লিখবার মতো তাদের নিজস্ব কোনও অক্ষর নেই। সেই কারনে এদের সাহিত্য, গান, গল্প প্রভৃতি মুখে মুখে রচিত।

'কথ্যভাষা' রূপেই এদের ভাষা স্বীকৃত।

(গ) এই উপজাতিদের বিয়ের বিষয়টা নিজেদের জাত বা সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এরা সাধারণতঃ নিজের জাতের বাইরে বিয়ে করেনা। নিজেদের জাতের মধ্যে বিবাহরীতি প্রচলিত।

(ঘ) এই সব উপজাতির মানুষেরা পুরানো চিরাচরিত রীতিকে অনুসরন করে জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে বজায় রাখতে চায়। পূর্ব পুরুষদের বেঁধে দেওয়া নিয়মে চলতেই এরা অভ্যস্ত। খুব কম উপজাতিই অন্য সমাজের আদব-কায়দা, নিয়ম-কানুন গ্রহন করেছে।

এদের জীবনযাত্রা এদের নিজস্ব রীতিতেই চলে। বিভিন্ন সময়ে কৃত আদমসুমারী অনুযায়ী জানা যায় যে, উত্তরবঙ্গের মোট জনসংখ্যার বেশীর ভাগ জনসংখ্যাই রাজবংশী সম্প্রদায়ের। এরা ছাড়া আর যে সব সম্প্রদায়ের মানুষ উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস করছে তারা হোলো:-

ক) জলপাই গুড়ি, পশ্চিম দিনাজপুর এবং মালদহ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী 'পলিয়া' সম্প্রদায়,

খ) মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় বসবাসকারী 'বেলদার' সম্প্রদায়ের মানুষ,

গ) মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী 'ভুঁইমালি' সম্প্রদায়ের এবং 'বিন্দ' সম্প্রদায়ের মানুষ,

ঘ) জলপাই গুড়ি, কোচবিহার এবং দার্জিলিং জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী 'দোসাদ' সম্প্রদায়ের মানুষ,

ঙ) দার্জিলিং ও মালদহ জেলায় বসবাসকারী 'তিয়র' সম্প্রদায়ের মানুষ।

চ) মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় বসবাসকারী 'রুশাখার' এবং 'নুনিয়া' সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠী । নৃতাত্ত্বিক বিচারে এরা তফশিলী জাতি বা উপজাতি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে । কিন্তু খোঁজ নিলে জানা যায় যে, এরা প্রায় সকলেই হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী । তাছাড়া বহুকাল ধরে বাঙালীদের পাশাপাশি থাকবার ফলে এরা প্রায় সব সম্প্রদায়ই বাঙালী সংস্কৃতি, আচার-আচরন, ভাষার সংগে পরিচিত হওয়ার ফলে এসবের সংগে গভীরভাবে যুক্ত হয়ে উঠেছে ।

এছাড়াও রয়েছে পোঁড়া হিন্দু এবং শক্তির উপাসক 'খেন' সম্প্রদায়ের মানুষ । কোচবিহার জেলার সীমান্তবর্তী এলাকায় বাংলাদেশের রংপুর জেলার অন্তর্গত 'কুড়ি গ্রাম' নামে একটি অঞ্চল রয়েছে । কথিত আছে যে, কোচবিহারের মহারাজা বিশ্বসিংহের মায়ের পরিবারের দিক থেকে মেচদের কুড়িটি পরিবার হিন্দু ধর্ম গ্রহন করে এবং কুড়ি গ্রামে বসবাস আরম্ভ করে । এরা 'কুড়ি ঘরানি' বলে পরিচিতি লাভ করে ।

উনিশশো একানব্বই সালের আদমসুমারী অনুযায়ী উত্তরবঙ্গের জাতিগত জনসংখ্যার একটি সারনি এখানে উল্লেখ করা হোলো :-

আরনি — ১

জেলা	রাজবংশী	কোচ	পালিয়া	টিয়র
দার্জিলিং	১৫, ৮৯৪	—	১	—
জলপাই গুড়ি	১৭২, ৭১০	১২৪	—	৩
কোচবিহার	২৫২, ৩৬৯	১	—	৬
পশ্চিম দিনাজপুর	৬৭, ৪৩৯	৩৩৯	১০, ০৪৪	১৪২১

১৯৭১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী আদিবাসীদের সংখ্যার একটি আরনি তুলে ধরা হোলো :-

আরনি:— ২

জেলা	মোট জনসংখ্যা	মোট আদিবাসীর - সংখ্যা
দার্জিলিং	৭, ৮১, ৭৭৭	১, ০৮, ৫৮৬
জলপাই গুড়ি	১৭, ৫০, ১৪১	৪, ২৮, ৫৯৫
কোচবিহার	১৪, ১৪, ১৩০	১০, ৬১১
পশ্চিম দিনাজপুর	১৮, ৫৯, ৮৮৭	২, ২১, ৩১৭

বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে। কিন্তু পারস্পরিক সহাবস্থান এবং সম্প্রদায় ও জাতিগত সংমিশ্রনের ফলে এদের মধ্যে নিজস্ব স্বাতন্ত্র সম্পূর্নভাবে রক্ষা পায়নি। বিভিন্ন সম্প্রদায়, ভাষা ও গোষ্ঠীর বিশাল জনসংখ্যা যেমন কোচ, মেচ, রাভা, গারো, পলিয়া, তিয়র, টোটো, কুড়িসর্জন প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সংগে মেলবন্ধনের ফলে মনে হয় সব এক পরিবার।

তবে একথা বলা যায় যে, বর্তমানে উত্তরবঙ্গে দুটি জনগোষ্ঠীরই প্রাধান্য বেশী। এদের মধ্যে একটি হোলো ভারত বিভাগের ফলে তৎকালীন পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তু বাঙালী সম্প্রদায়ের মানুষ এবং রাজবংশী জনজাতির মানুষ।

উত্তরবঙ্গের বেশীর ভাগ নদীই ভূটান, সিকিম, ও তিব্বত-এর পাহাড় অঞ্চল থেকে নেমে এসে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির বিভিন্ন অঞ্চল দিয়ে বয়ে চলেছে। ফলে খরস্রোতা এই নদীগুলি বর্ষার সময় ভীষন আকার ধারন করলেও শীতকালে জলের পরিমান একেবারেই কমে যায়। উত্তরবঙ্গের 'দোলা' অঞ্চল অর্থাৎ নীচু অঞ্চলে আগাছা, ঘাস ইত্যাদি জন্মানোর ফলে গোরু মোষ চরাবার অনুকূল স্থান। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির বিভিন্ন অঞ্চল দিয়ে বয়ে চলেছে মহানন্দা, করতোয়া, জলঢাকা, তিস্তা, তোরষা, মেচি, বালাসন, রায়ডাক, ধরলা, ট্যাংগান, পুনর্ভবা, সংকোশ, আত্রেয়ী, কালিন্দী, কানজানী নামের নদীগুলি।

পৃথিবীর প্রাণীকুল গাছপালা, কীটপতঙ্গ প্রত্যেকেরই বেঁচে থাকবার জন্য প্রয়োজন জলের । জলবাহী নদীগুলি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রত্যেক জাতের মানুষের কাছে বিভিন্নভাবে পূজিত হয়ে থাকে । যেমন তিস্তানদীর পূজাকে তিস্তাবুড়ী পূজা' মেচেনী খেলা' বা 'ভেদেই খেলা' বলে । এই পূজায় নৃত্য ও গীতের প্রচলন রয়েছে । তিস্তানদী মেচ সম্প্রদায়ের কাছে খুব পবিত্র নদী । মেচ সম্প্রদায়ের বিশ্বাস অনুযায়ী তিস্তানদী পার্বতী ও গঙ্গার মিলিত রূপ, এখানে সংগৃহীত তিস্তাবুড়ী পূজার একটি গান লিপিবদ্ধ করা হোলো :-

নাহি জল নাহি থল নাহি তারা আকাশ
এই ছিরি মন্তর না হয় ছিরিকো বিনাস ।
বায় হাতে চম্পা কেলা ডাহিনে শঙ্ক জল
তাহার উপর আসন কৈল ধর্ম নিরঞ্জন ।
পূর্বে না বন্দিব পীর পাকাম্বর দক্ষিনে বন্দিব মা কালীর চরন,
পশ্চিমে বন্দিব সমুদ্র সাগর উত্তরে বন্দিবপানলবাহিনী বুড়ি ।
আকাশে পান্নায় করি আকাশের কামিনী
পাতালে পন্নায় করি পাতাল বাসুকী ।।
শূন্যের মইদ্যে পন্নায় করি বুড়াবুড়ী
পাটের মইদ্যে পন্নায় করি মহামায়ী তিস্তাবুড়ী ।

(চারু চন্দ্র সান্যাল|জলপাই গুড়ি)

—গানটিতে ছিরি মন্তর অর্থে — শ্রীমন্ত্র

শঙ্ক অর্থে -- শঙ্খ,

পচিমে অর্থে - পশ্চিমে

সমুদ্র অর্থে - সমুদ্র,

পানপরাহিনী -- প্রান প্রবাহিনী,

পন্নাম - প্রনাম,

মইদ্যে - মধ্যে

পাটের - পটের, ছবির ।

সৃষ্টির প্রথমে অজ্ঞতা প্রসূত ভয় থেকে মানুষ পাহাড়, নদী, গাছপালা, ভূত, প্রেত, দানো প্রভৃতির পূজা করা শুরু করে তাদের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য । পরবর্তী সময়ে ধীরেধীরে এগুলো ধর্মের ভিত্তিতে মিলেমিশে ধর্মীয় অঙ্গ হিসেবে প্রাধান্য লাভ করে । পরে লোকায়ত সংস্কার আর ধর্মাচরন মিলেমিশে এক হয়ে এক গম্ভীর রূপ - ধারন করে । এখানে উল্লিখিত বিষয়গুলো এই যে, ---

ক) আর্যরা মূর্তি পূজা না করে দেবতার সন্তুষ্টিবিধানের জন্য 'হোমাগ্নি' প্রজ্বলন করে ।

খ) মহেঞ্জোদরোর দ্রাবিড়রা শিব মূর্তির - পূজা করে ।

গ) অস্ট্রিকরা পাথর, গাছের পূজা করে পান, সিঁদুর সহযোগে । এথেকে লক্ষ্য করা যায় যে, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন

ধরনের প্রক্রিয়া থেকে গাছ, পাথর, জঙ্গল, নদী, বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করা বা স্তুতি করবার ধরনধারন গ্রহন করেছে। ফলে উত্তরবঙ্গ বিভিন্ন ধর্মমত আর লোকাচার বিষয়ে প্রাধান্য লাভ করেছে। তার এইসব গৃহীত ধর্মাচরন, সংস্কৃতি রূপ পেয়েছে মুখে মুখে প্রচলিত বিভিন্ন ঘটনা বা কাহিনী নিয়ে(যা পরবর্তী সময়ে ঘটনা বা কাহিনী নিয়ে) যা পরবর্তী সময়ে মৌখিক সাহিত্য হিসেবে বিশেষ পরিচিতি পেয়েছে।

শিবকে কেন্দ্র করে হয় 'পানেশ্বরী' বা 'শাল-শিরি' পূজা। শিবকে কৃষির দেবতা হিসেবে গণ্য করা হয়। তাই অরণ্যে প্রবেশের অনুমোদন এবং বিপদ আপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্য অরণ্যের এক প্রাচীন বৃক্ষকে পূজা করা হয়। ক্ষেতের ফসল ইত্যাদির শুভ কামনায় গোরক্ষনাথের পূজা করা হয়। আবার মালদহের গম্ভীরা গানের মাধ্যমে শিবের কাছে গাওয়া হয়,—

৫

শিব কি করিবো হে এবার বাঁইচবে না পরান
ট্যাহা স্যারের চাউল হয়্যা লাইগ্যা গেইল্ টান।।
যোগো দ্যাশের আম্র ফলটি সেও হইল মাটি
পলু পুশা মাছি দিশা দর হইল খাঁটি।।
দর হইল কুড়ি পঁচিশ পলু পুশা লাগছে যে দিস
এ ক্যামোনে হইল দ্যাশের ধারা বল বাঁইচবো ক্যামনে।।
কিষকেরা ভাইবৃছে বস্যা উপায় কিবা করিহে
ধান কলাই হইল্ না ভাই হইল্ না জলকারি হে

ওরে ক্যামনে হেলায় [illegible] বিনা সব রইল গরু বকরী ।
আরে মইল বিষম জ্বালা ক্যামনে বাঁইচ্যাম ছেইলে পিলা হে ।।

(বাংলার পল্লীগীতি -- চিত্তরঞ্জন দেব)

রাজবংশী সমাজের 'শারাম' পূজায় 'তিস্তাবুড়ী' মাদার ও সত্যপীর, হরিবোলা, খানকালী, হাওয়াকালী বা ভদ্রা কালীর পূজা হয়। 'শারাম ঠাকুরের' কোনও নির্দিষ্ট মূর্তি নেই। গ্রামের একপ্রান্তে কোনও বাঁশ বাগানে এই পূজা হয়ে থাকে।

বৃষ্টির কামনায় রাজবংশী সমাজে 'হুদুম দ্যাও' বা ব্যাঙের বিয়ে প্রচলিত। 'হুদুম' শব্দটির অর্থ উলঙ্গ। অমাবস্যা তিথিতে বাড়ী থেকে দূরে অথবা মহিলারা উলঙ্গ হয়ে সমবেতভাবে

এই অনুষ্ঠানে করে। দুজন স্ত্রীলোক লাঙল টানে এবং একজন হাল ঠেলে। অন্যান্য মহিলারা সমবেত হয়ে নৃত্যের তালে তালে গান, গায়, -----

"হিলহিলাইছে- কমরটা মোর শিরশির্যাছে গাও।
কোন্ঠে কোনা গেইলে এলা হুদুমার দ্যাকা পাও।"----

ধান কাটবার পর বৈশাখ মাসে বাঁশ খেলা বা, 'মদনকাম পুজা' নামে একটি ধর্মানুষ্ঠান পালন করবার প্রথা রয়েছে, উত্তরবঙ্গের আদিবাসী সমাজে। সাতটি বাঁশের মাথায় রঙিন কাপড় জড়িয়ে পুরুষরা বাড়ী বাড়ী নাচগান করে। এই সাতটি বাঁশ'শালশিরি', 'তিস্তাবুড়ী,' 'মদনপীর,' 'বিষহরি,' 'কালী', 'গারার', 'সন্যাসী', নামে পরিচিত সাতটি লোকাচার এবং ধর্মের প্রতীক বলে চিহ্নিত। এছাড়া ওঝাদের ঝাড়ফুঁক, মারন উচাটন ইত্যাদি উত্তরবঙ্গের সার্বিক জীবনযাত্রার নির্ভরশীল ক্রিয়াকর্ম।

শুধুমাত্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্যেই নয়, বাইরে থেকে আসা নানাজাতির, নানাগোষ্ঠীর মানুষের মিশ্রনে জলপাই গুড়ি জেলার জনজীবন বিন্যস্ত। তাত্ত্বিকদের মতানুসারে তিব্বত থেকে আসা মোঙগলীয় গোষ্ঠীর একটি শাখা টোটো উপজাতি। এই উপজাতির অস্তিত্ব রয়েছে শুধুমাত্র জলপাই গুড়ি জেলার মাদারীহাট

থেকে প্রায় তেইশ কিলোমিটার জঙ্গলময় অঞ্চল পেরিয়ে ভুটান সীমান্তবর্তী এলাকা টোটোপাড়ায়। খরস্রোতা নদী তোরষা, দুর্গম তি-তি অরণ্যের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যবেষ্টনীর মধ্যে দীর্ঘদিন লোকচক্ষুর আড়ালে ছিলো টোটোরা। এদের নামানুসারেই এদের বর্তমান বসতির নাম টোটো পাড়া।

টোটোদের নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের মূল্যবান কাজ হয়েছে। ইংরেজরা এদেশে তাদের শাসনব্যবস্থা কায়েম ও বলবৎ করবার জন্য তৎপর ছিলো। বিশেষত: ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থাকে দৃঢ় করবার জন্য তারা উত্তর পূর্ব ভারতের বিভিন্ন সমাজ, সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিলো।

। ভূমিজরীপ, জনগননা ব্যবস্থার মাধ্যমে ইংরেজরা এইসব তথ্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে সংগ্রহ করে। ডি, সুন্দর তাঁর জরীপের কাজের রিপোর্টে অন্যান্য ভাষার সংগে টোটো ভাষারও একটি তালিকা দেন। শ্রী গ্রি[illegible]র লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অব ইন্ডিয়া বইতে টোটোদের ভাষার [illegible] দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন।

শ্রীবিমলেন্দু মজুমদার তাঁর প্রকাশিত "দি টোটোস্" বইটিতে টোটো সমাজের অনেক তথ্য সংকলিত করেছেন। সুস্মিতা বসুও তার গবেষণা পত্রে টোটো ভাষার রূপরেখা তুলে ধরেছেন।

জলপাই গুড়ি জেলার টোটো উপজাতিদের সম্পর্কে ঐতিহাসিক ও সামাজিক বিষয় নিয়ে কিছু আলোচনা হয়েছে। কিন্তু টোটোদের মৌখিক সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিয়ে বিশেষ আলোচনা হয়নি। প্রত্যেক জনগোষ্ঠীই তাদের নিজস্ব ভাষার ধারক ও বাহক। সে ভাষা কথ্য ভাষা বা মৌখিক ভাষাই হোক বা লিখিত ভাষাই হোক। টোটোদের নিজস্ব ভাষা টোটো ভাষা। কিন্তু টোটোদের কোনও লিপি নেই বলে (অন্য অর্থে লিখিত বর্ণ নেই) তাদের ভাষা মৌখিক।

টোটোদের মৌখিক সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আলোচনা খুব কম। এই কারনেই টোটোদের মৌখিক সাহিত্য ও সংস্কৃতির রূপরেখা তুলে ধরবার জন্যই এই গবেষনা প্রকাশের অবতারনা করা হোলো। গত প্রায় নয় বৎসর যাবত বারবার টোটোপাড়ায় গিয়ে টোটোদের সংগে পরিচিত হবার চেষ্টা করে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেছি।

প্রসংগত উল্লেখ্য যে,

ইতি পূর্বে টোটোদের মৌখিক সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিয়ে যারা কাজ করেছেন, তা স্বল্পসংখ্যক। আমি টোটোদের মৌখিক সাহিত্য ও সংস্কৃতির একটি সামগ্রিক পরিচয় তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি। আশাকরি আমার এই গবেষনাকাজে তার পরিচয় পাওয়া যাবে। আমার এই গবেষনা সম্পূর্নভাবে ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে সম্পন্ন করেছি। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আলোচনার ধারা যথাযথভাবে বিন্যস্ত করবার চেষ্টা করেছি।

প্রথম অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় হোলো টোটো সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিক ও সামাজিক বিবরন। কিভাবে এই সম্প্রদায় এই টোটোপাড়ায় এসে তাদের বসবাস শুরু করেছে এবং কিভাবে তারা একটি বিশিষ্ট সমাজ গড়ে তুলেছে, এই আলোচনায় তা স্থান পাবে। একই সংগে বর্তমানে তারা কিভাবে জীবনযাপন করছে, তাদের জীবিকা কি ধরনের, তাদের জনসংখ্যা, বাসগৃহ ইত্যাদি প্রসংগগুলি এ অধ্যায়ে আলোচিত হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়টির আলোচ্য বিষয় টোটো সম্প্রদায়ের উপর ক্ষেত্র-সমীক্ষার মাধ্যমে তাদের বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান, সংস্কৃতি সম্পর্কে যেসব তথ্য পাওয়া সম্ভব, তার ভিত্তিতে সেগুলির বিবরন দেওয়া। টোটোদের বিভিন্ন পরিচিতি নিয়ে লিখিত কোনও তথ্য নেই বলে ক্ষেত্র সমীক্ষায় মৌখিক তথ্য সংগ্রহ করে

15860

0 2 JAN 2002

লিপিবদ্ধ করা হবে।

তৃতীয় অধ্যায়ে টোটোদের সংস্কৃতি এবং মৌখিক সাহিত্যের (দ্বিতীয় বিভাগের অধ্যায়ে বর্ণিত) রূপান্তর সংকলিত হবে টোটোভাষায়।

চতুর্থ অধ্যায়ের উদ্দেশ্য হবে লোকসংস্কৃতির তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে টোটো সম্প্রদায়ের উল্লিখিত মৌখিক সাহিত্যের পর্যালোচনা করা।

পঞ্চম অধ্যায়টিতে থাকবে টোটো সম্প্রদায়ের [illegible] ও মৌখিক সাহিত্যের [illegible] বাংলা তথা ভাষা ও মৌখিক সাহিত্যের তুলনা।

উপসংহার বিভাগটিতে টোটোদের মৌখিক সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের স্বরূপ তুলে ধরা হবে।

টোটোভাষা বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। [illegible] টোটোভাষা [illegible] [illegible] [illegible] এই সম্প্রদায় নিজেদের মৌখিক [illegible] ও সংস্কৃতির

ঐতিহ্যে আবার এবং চেষ্টা করে

টোটোদের [illegible] লিখিত প্রবন্ধ প্রকাশের পরে [illegible] পাই শুধু তেমনই টোটোদের নানা পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলিতে সংগ্রামকারী কয়েকটি বিভিন্ন অঙ্গুলি [illegible] কিছু বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। ইতিপূর্বে টোটোদের [illegible] ও সংস্কৃতি বিষয়ে নানা [illegible] [illegible] টোটোদের মৌখিক সাহিত্য ও সংস্কৃতির একটি [illegible] পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। [illegible] এই [illegible] তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

(ক) মেচ

এরা মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর একটি জনজাতি বলে মনে করা হয়। এরা শতকরা আশানব্বই ভাগ পাহাড়-সান্নিধ্য এলাকায় বাস করে। 'মেচ' বা 'মিচ' শব্দটির অর্থ হোলো, 'মি' অর্থে মানুষ এবং 'চ' অর্থে সন্তান। মেচ অসমের বোড়ো সম্প্রদায়ভুক্ত। 'কোচ' শব্দটি 'কুবাচ' থেকে আর্যসংস্কৃতি বললেও ড: পি. সি. বাগচীর মতে 'Kam-Po-Yona' ([illegible]) বা 'কামোচা' থেকে এসেছে।

বোড়োদের মধ্যে যারা হিন্দু ধর্ম গ্রহন করে তারাই 'কোচ' নামে পরিচিতি লাভ করে। অসমের ভাষাচার্য শ্রীবানী কান্ত কাকোতি-র মতে, এই কোচ বংশের আদি পুরুষ 'হাঁড়িয়া মন্ডল' বোড়ো-মেচদের মন্ডল বা দলপতি ছিলেন। 'হাঁড়িয়া কোনে' অর্থাৎ উত্তর পশ্চিম-সীমান্তে তাঁর বসবাস ছিলো এবং সেজন্যই তিনি 'হাঁড়িয়া মন্ডল' নাম পেয়েছিলেন।

উত্তরবঙ্গের আদি উপজাতিদের মধ্যে জনসংখ্যার দিক থেকে মেচ উপজাতিই সংখ্যাগরিষ্ঠ। এদের গায়ের রং হলুদ আভাযুক্ত ফরসা। চোখ ছোট। নাক, ঠোঁট ও চোয়ালের গঠনে মঙ্গোলীয় ছাপ প্রকট। গোঁফ-দাড়ি কম। চুলের রং কালো। এদের দেহ সুঠাম, উচ্চতা মাঝারী।

প্রাচীনকালে যাযাবর-চাষী-জীবনই ছিলো মেচদের জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। 'ঝুম' চাষ ছিলো তাদের অন্যতম জীবিকা।

এদেশে ইংরেজ আসবার পর জমিজমা জরিপ হওয়ার ফলে তাদের অবাধ - বিচরনে বাধা পড়ে । তার ফলে তাদের স্থায়ী ... নির্ভর জীবনযাত্রা - শুরু হয় ।

ধান মেচদের প্রধান শস্য । মেচদের ভাষার নাম - 'বোড়ো ভাষা' । তাদের কোনও বর্নমালা নেই । সম্প্রতি কেন্দ্রীয় - সরকারের চেষ্টায় 'দেবনাগরী' লিপিকে নিজেদের লিপি হিসেবে - গ্রহন করেছে । তবে 'বঙ্গ-অহোম' লিপির উপর মেচদের আস্থা বেশী ।

মেচদের লোকসংগীত এবং লোকসাহিত্য খুবই - সমৃদ্ধ ।'বোড়ো' শব্দের অর্থ 'জ্ঞান পুরুষ' অর্থে মানুষ ।'বোড়োবিচা,' বোড়োদের সন্তান । অনুমান করা হয় যে, জলপাই গুড়ি জেলার সংকোশ- নদীর পাশে 'বারোবিশা' নামের অঞ্চলটি 'বোড়োবিচা'-র অপভ্রংশ ।

কোচবিহার-এর মহারাজ বিশুসিংহের দুই ছেলে - নরনারায়ন এবং সংগ্রাম সিংহ ওরফে চিলা রায়-কে কোচদের মধ্যে প্রথম সংস্কৃত ভাষাজ্ঞানী বলে মনে করা হয় ।

মেচদের উদ্ভব এবং জন্ম সম্বন্ধে একটি লোককথা প্রচলিত আছে । কথিত যে, মেচদের আদি পিতা 'গুরুংগো' আর মিসনিমা, এদের লেপচা, মেচ আর তিমদার নামে তিন সন্তান ছিল । এই সন্তানদের বংশধরদের নামেই তারা পরিচিতি পায় ।

উত্তরবঙ্গের উপজাতিদের মধ্যে শিক্ষার দিক থেকে - মেচরা সবচেয়ে বেশী এগিয়ে ।

মেচ-রা বাড়ীতে 'এন্ডি' পোকা পোষে। 'টাকুয়া' নামে হস্তচালিত - যন্ত্রে সুতা কাটে। এরা শাল গাছের যে, পুজা করে তার নাম 'শালশিরি'। পুজায় এরা পায়রা, শুয়োর বলি দিয়ে পুজা শেষে সেই সব বলির মাংস খায়। 'সীর্জ' গাছ এদের বড়ো দেবতা এবং 'বাথৌ' নামে পরিচিত। মেচরা - দোতরা, একতারা এবং বড় ঢোল বাজিয়ে নাচ, গা[illegible] করে। এখানে - মেচদের 'বাগরুমবা' গানটি তুলে ধরা হোলো—

"বা হায় বাগুরুমবা
হায় বাগুরুমবা।
জাত নআবালা,
খুন নআবালা,
খাবীরাম হমনাৈ বামানৈ
লাগৌমানখা হায়
লাগৌমানখা। —
খুরিবারিনি দাওসেন
জাংনি লাগীয়া দাজেন
গাযা হাসার হাসার মাসাদে
কগুরুম বাগুরুম মাসাদে।
দৈ জিরি জিরি [illegible]যো খিংখিরি
সোনানি জিংশ্রি
হায় জিংশ্রি হায় জিংশ্রি।"

-মেচভাষায় প্রচলিত এই গানটি,

বিভিন্ন ধরনের বাজনার সংগে নৃত্যগীতে অতুলনীয়। এখানে এই গানটির ভাবানুবাদ লিপিবদ্ধ করা হোলো, —

'বাগরুমবা নাচো,
প্রিয় বাগরুমবা নাচো।
আমার জাত, আমার মুগোত্র নাহলে
তোমায় আমি বাঁধিতাম প্রেমের বাঁধনে
তোমায় নিতাম আপন কোরে,
আপন কোরে।
কাশবনের পাখি যেওনা
আমাদের ছেড়ে,
বাগরুমবা নাচো আপন মনে।
শামুকের সারি
যেন সোনার হার
নদীর জলে, সোনার হার।
প্রিয়,
সাজালো সোনার হার।'
(কবিতায় ভাবানুবাদ– ঝরনা বসু)

—মেচভাষায় কয়েকটি পরিচিত,

শব্দ এখানে উল্লেখ করা হোলো,—

মেচ		বাংলা
ক) দৈ-না	⟶	ডায়না, (যা পরবর্তী সময়ে রূপান্তরিত)
খ) দৈ—মা – নি	⟶	দোমহনী, – ঐ –
গ)'ডি' বা দৈ	⟶	জল বা নদী অর্থে ব্যবহৃত,

(খ) রাভা —

নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে রাভা জনজাতিও - মঙ্গোলয়েড জনগোষ্ঠীর একটি শাখা বলে মনে করা হয়। মেচ, গারো জনজাতির সংগে রাভাদের চেহারার যথেষ্ট মিল রয়েছে। গায়ের রং তামাটে, উচ্চতা মাঝারী। শরীরের গঠন সুঠাম।

রাভাদের বিশ্বাস যে, মহাদেবতা - 'ঋষি' মানব সমাজকে মেচ, কোচ, লিম্বু ও লেপচা নামে চারভাগে - পৃথিবীতে আনেন। এদেরই বংশধরদের মিলনের ফলে পরবর্তীকালে - 'রাভাতাং' নামে নতুন গোষ্ঠীর জন্ম হয়। এরাই বর্তমানে'রাভা' উপজাতি নামে পরিচিতি।

রাভাদের নিজস্ব ভাষা আছে। রাভা-ভাষা বৃহত্তর বোড়ো ভাষাগোষ্ঠীর একটি শাখা বলে মনে করা হয়। রাভা ভাষাতেও লোকসাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে।

রাভাদের কোনও লিপি নেই। এরা - বাংলা মাধ্যমেই লেখাপড়া করে। ভোট- চীন ভাষাগোষ্ঠীর ভোট -

এক শাখার অন্তর্গত বলেও অনেকে মনে করেন ।

রাভারা বাঁশ দিয়ে ব্যবহারযোগ্য দ্রব্য - তৈরীতে নিপুন। বাঁশের সূক্ষ্ম কাজে এরা দক্ষ। রাভা মেয়েরা তাঁতের - কাজে খুবই দক্ষ।

রাভাদের মধ্যে শিক্ষার হার খুব কম ।

অনেকে রাভাদের 'কোচ' বলে উল্লেখ করেন । অনেকে মনে করেন 'পানিকোচ' এবং রাভা জনজাতি একই জনজাতি ।

রাভাদের সংস্কৃতি খুবই ঐতিহ্যময় । এরা - নৃত্য গীতে পটু । দলবেঁধে নৃত্যগীত করে ।

ধান রাভাদের প্রধান খাদ্যশষ্য । কৃষিকাজ - এদের প্রধান জীবিকা । রাভারা মূলত: মাতৃতান্ত্রিক উপজাতি । জন্মসূত্রে এরা মাতৃকুলের 'নুমুক' বা 'গোত্র' দ্বারা পরিচিত হয়ে থাকে । তবে বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রাধান্যলাভ - করেছে ।

ভাত, মাংস এবং 'চাকৎ' বা মদ এদের যে, কোনও উৎসবের প্রধান উপকরন। এরা পান-সুপারী খেতে ভালোবাসে ।

রাভা-দের ভয়ংকরের দেবতা 'খোরমোঙ্' । 'চোরিহাচু' নামে পাহাড়ের মাথায় এই দেবতা আধিপত্য করেন । রাভা এবং গারো এই দুই উপজাতিই এই দেবতার পূজা করে ।

রাভা-রা মৃতদেহ দাহ করে। এদের এই অনুষ্ঠানটিতে হিন্দু প্রভাব বেশী লক্ষ্য করা যায়। রাভা-রা পরজন্মে বিশ্বাসী।

রাভা-রা জলপাই গুড়ি ও কোচবিহার-অসম সীমান্তে বেশী বসবাস করে। রাভাদের সমাজে রাজবংশী সমাজ দ্বারা বর্তমানে বেশী প্রভাবিত। রাভা যুবকরা বর্তমানে রাজবংশী ভাষায় কথা বলছে। শহরে শিক্ষিতরা আবার বর্ণহিন্দু বাঙালীদের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে।

রাভা ভাষায় অনেক ধরনের গান রচিত হয়েছে। এখানে রাভা সমাজে মৃতের সৎকারের একটি প্রচলিত গান লিপিবদ্ধ করা হোলো, —

" হামাং ও বাকা ই মইন
নৈয়া নিগা নিলাযায়
হে মা নিগা চিকা হামাগায়।
চাং হৈ চাং চৈহ সে
উয়ান নাওয়া বুঙন সে
কা চাবান নৈং নুং খুং
ঈশারাওয়া খুঙ খুঙ লঙো
চিকা দোয়াই নেকি মনন
ফেন ফৈ নেয়ই
নিঙন মুঙো গাতায় রইমন
কালাঙ বুন উরন। "

বাংলায় ভাবানুবাদ :—

এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে চলে যাব আমি
নশ্বর দেহ নিয়ে যাবে শ্মশান ঘাটে
হায় কে আমার আপন,
কে আমার পর ।
কোথায় আমার ঘর, কোথায় আমার ঠাঁই ।
ঐ নদীর নির্জন পারে রেখে যাবে আমাকে
হায় আমি একা, সাথী কেউ নেই
নেই কোনো দিশারী
কি করে পার হব তরঙ্গ উত্তাল বৈতরনী
হে ঈশ্বর, তুমি ছাড়া কে আর আছে আমার ?

রাঙা সমাজে 'মাছ ধরা'র গান

খুব সুন্দর ভাবে পরিবেশিত হয় নৃত্যগীতের মাধ্যমে ।
এখানে সেই 'মাছ ধরা'র গানটি লিপিবদ্ধ করা হোলো —

ফালাকাটাঙি পালাউ আনাও
ফালাকাটাঙি পালাউ ।
শিঙি মারিঙি দুকু আনাও
শিঙি মারিঙি দুকু ।
উ দুকু বইন, উ পালাউ বইন
চিনা জোরা হাসাঅয় নাকচেৎ রেতিয়া
আনাও না রেতিয়া ।
নাং পালাউ নো আনাও

আং দুকু নৌয়া ।

চিকা জোরা হাসা আয় নাক চোং রেতিয়া

আনাও না রেতিয়া ।

উনাক চেং রেতি অইন বাজারাং নৌইয়া

ভৌগ ভৌগ কানে অইন ।

ভাগা গসা তানা আনাও

ভাগা গসা তানা

উ ভগা কানে অইন

গয় গিনি সাজা আনাও

গয় গিনি সাজা ।

রাসান বা দুনাংতা বুগিনা বা পুনাংতা

নায় আনাও নগুয়াং নৌয়া সৌ ই

গয় আনাও ।

বাংলায় ভাবানুবাদ :—

ফানাকাটার জাকৈ নিয়ে

শিউমারির খানুই নিয়ে

মাছ ধরতে চলরে দিদি যাই ।

ঝরনার জলে

আর কোরার জলে

চিংড়ি মাছ ধরব

আর বেচব হাটে গিয়ে ।

এক ভাগা তার বিক্রী করে
একখিনি পান মিষ্টি খাব
মাছ ধরা তো আজ হোলো
দিদি এবার বাড়ী যাবো ।

ঐ যে দেখ বকের সারি
যাচ্ছে ফিরে যে যার বাড়ি ।"

_____ রাভা সম্প্রদায়ের নাচে গানে
তাদের জীবনের ও জীবিকার ছন্দ এসেছে ।
এখানে রাভাদের নৃত্যগীতের কয়েকটি শব্দ
উল্লেখ করা হোলো, ——

ক) হাংগায় আনি — বীজ বপনের নৃত্য
খ) নাকচেং রেনি — চিংড়ি মাছ ধরার নৃত্য
গ) হানুদা বারু — যুদ্ধ নৃত্য । (হানুদা-তরবারি, বারু — ঢাল)
(রাভা মেয়েরাও যুদ্ধে যেত ।)
ঘ) বাসর পিদান — নববর্ষ বরনের নৃত্য
ঙ) সরু কান চুলি — অতিথি-বরন নৃত্য
চ) হা-পাডি — নতুন জমি আবাদের নৃত্য ।

গ) — গারো —

উত্তরবঙ্গের এক প্রাচীন উপজাতি গারো। নৃতত্ত্বের - দিক থেকে এদের মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীর একটি শাখা হিসেবে মনে করা হয়। এরা গারো পাহাড়েই অধিকাংশ থাকে। তাছাড়া উত্তরবঙ্গের জলপাই গুড়ি জেলায় এবং আসাম- বাংলা সীমান্তেও ওদের বসবাস। ইদানীংকালে গারোদের কোচবিহার জেলায় নাটুয়ার পার, কালিকাতা, দিনহাটা ও পুঁটিমারীতে দেখা যায়। তাছাড়া এদের জলপাই গুড়ি জেলার আলিপুর দুয়ার মহকুমার নিকটবর্তী দমনপুর ফরেস্ট, কলাবস্তি, গোরোবস্তিতেও দেখতে - পাওয়া যায়।

গারোদের দেহের গঠন সুঠাম। উচ্চতা মাঝারী। গারো পুরুষ ও মহিলা দেখতে সুন্দর। এদের ভাষা ভোট-বর্মী গোষ্ঠীর বোড়ো শাখার অন্তর্গত। এরা বাংলা - ভাষার মাধ্যমেই লেখাপড়া শিখছে।

গারো ভাষায় লোকসাহিত্যের ভান্ডার মোটামুটি। এরা নৃত্যগীতে পটু। বাদ্যযন্ত্র হিসেবে বাঁশি, মাদল ব্যবহার করে। চাল থেকে এরা একধরনের সুরা তৈরী করে। এদের উৎসবে সুরা পান করবার রেওয়াজ আছে।

গারোদের মধ্যে শতকরা প্রায় নব্বই ভাগই খৃষ্টান হবার আগে এদের মৃতদেহ চারদিন রেখে দেওয়ার প্রথা ছিল। দাহ করবার পর মৃত ব্যক্তির হাড় একটি মাটির পাত্রে রেখে দেওয়া হোতো। তবে অপঘাতে মৃত্যু হলে এরা সেই সব মৃতদেহকে কবর দেয়।

গারোরা বাঁশ দিয়ে বাড়ী ঘর তৈরী করে। মাটি থেকে অনেকটা উঁচুতে ওরা বাড়ী তৈরী করে। বাড়ীর বা গৃহের মেঝে তৈরী করে বাঁশের ফালি দিয়ে। টোটোদের ঘরের সংগে গারোদের ঘরের অনেকটা মিল পাওয়া যায়।

গারোদের গায়ের রঙ ফরসা। এদের চেহারায় মোঙ্গলীয় বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। চাষবাস প্রধান জীবিকা। ভাত এদের প্রিয় খাদ্য। কচি বাঁশের অঙ্কুর, মাছ, মাংস, আলু, কচু এদের প্রিয় খাদ্য। পান-সুপারী সব অনুষ্ঠানেই ব্যবহৃত হয়। এদের গৃহজাত মদকে 'চু' বলা হয়।

গারোদের প্রধান গোত্র দুটি।
এই গোত্র দুটির আবার অনেক শাখা আছে। এদের বলে 'বাচ্চি'।

গারো ভাষাই এদের নিজস্ব ভাষা। তবে - উত্তরবঙ্গের গারোরা অনেকে বহুভাষায় কথা বলতে পারে। তবে - গারো ভাষায় লিখিত কোনও সাহিত্য নেই। গারোদের মধ্যে - বিবাহবিচ্ছেদ, বিধবা বিবাহ প্রচলিত। 'ওয়াংগালা' গারোদের সবচেয়ে বড় উৎসব। এদের প্রধান ফসল ধান পাকবার পর এই উৎসব শুরু হয়।

গারোদের প্রধান দেবতা হল 'খাম্নি - শালজোঙ'।' এই দেবতার স্ত্রীর নাম 'আপোং-মা'। এরা ভূত, প্রেত ও নানারকম অলৌকিকে বিশ্বাস করে। অসুস্থ হলে বনজ লতা-পাতা, শেকড় ব্যবহার করতেই এরা অভ্যস্ত।

গারোরা পরজন্মে বিশ্বাসী। মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির - আত্মা 'রিংমিংরাম' বা 'মর্ত্যের স্বর্গে' গিয়ে পূর্বপুরুষদের সংগে মিলিত হয়ে আবার নতুন জন্ম নিয়ে পৃথিবীতে আসে বলে তাদের - বিশ্বাস।

গারোরা খুব মিশুকে। বর্তমানে গারোদের বিভিন্ন উৎসবে নতুন প্রজন্মের ছোঁয়া লেগে সবই পাল্টে যাচ্ছে।

ঘ) লেপচা —

লেপচাদের আদি বাসভূমি সিকিম। এদের চেহারার সংগে আসামের খাসিয়াদের সংগে কিছুটা মিল দেখা যায়।

উত্তরবঙ্গের পার্বত্য অঞ্চলের অন্যতম প্রাচীন - বাসিন্দা লেপচা। এরাও মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীর শাখা বলে মনে - করা হয়। অনেকে মনে করেন এরা মেচ বা বোড়ো গোষ্ঠীর একটি

শাখা । আরও একটি মত এই যে, এরা ষোড়শ শতাব্দী বা তারও - আগে তিব্বত থেকে এসে বসবাস শুরু করে । ভৌগোলিক কারনে - পরবর্তীকালে এদের মধ্যে বিভিন্ন পরিবর্তন আসে এবং সমতলে - স্বগোত্রীয় ভাইদের থেকে এরা একটু আলাদা হয়ে যায় ।

অনেকে মনে করেন এরা চীন থেকে ব্রহ্মদেশ হয়ে ভারতে প্রবেশ করে ।

লেপচারা সাংস্কৃতিক দিক থেকে খুব উন্নত - । এদের নিজস্ব ভাষা আছে । নিজস্ব লিপি আছে । বিজ্ঞানীদের মতে লেপচা ভাষা পৃথিবীর প্রাচীন ভাষাগুলির অন্যতম । এই ভাষা তিব্বত-হিমালয় গোষ্ঠীর একটি শাখা ।

প্রাচীন লেপচা ভাষায় পাঁচটি উপাখ্যান - আছে।—

ক) সুতেন চি (বা মুতেন চি) —— পৌরাণিক উপাখ্যান ।

খ) দামরাজো —————— শস্য বিষয়ক উপাখ্যান ।

গ) থালা—থাপ সুচি—থাপ —— প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিষয়ক উপাখ্যান ।

ঘ) ফেনলোক —————— যুদ্ধ বিষয়ক উপাখ্যান ।

ঙ) প্যাসু লোহমা-লোহমা —— ঐতিহাসিক বীরগাঁথা বিষয়ক - উপাখ্যান ।

আগেকার দিনে লেপচাদের মধ্যে মাতৃতান্ত্রিক - সমাজ ব্যবস্থার প্রচলন ছিল । এখনো দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চলে এই

প্রথার প্রচলন রয়েছে। সেখানে সন্তানেরা এখনও মায়ের পদবীতে পরিচিত হচ্ছে। লেপচাদের সমাজে মায়ের ভূমিকা সম্মানজনক। তবে কালের প্রভাবে এদের মধ্যেও পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা এসে গেছে। লেপচাদের মধ্যে মহিলার সংখ্যা কম।

বর্তমান যুগেও লেপচাদের জীবনে 'লামা'-দের গুরুত্ব অপরিসীম।

লেপচাদের মধ্যে পাঁচটি গোত্র রয়েছে:—

ক) থিঙ্কু-স্যানও ,

খ) স্যান —দেন—মু ,

গ) হি-মু ,

ঘ) লিও - সিও-মু ,

ঙ)কথাক-মু

———— লেপচা ভাষায় ঘটককে বলে ''পামী- বু'' । এই ঘটকের মাধ্যমে যে, বিয়ে ঠিক হয়, তাকে লেপচা ভাষায় 'মাংগী বিহে' বলে। এদের বিয়েতে কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠান নেই। বিয়েতে গরু মেরে গরুর মাথা উৎসর্গ করা হয়। তাছাড়া সেদ্ধ - মাংস, ভাত, ছাও, কোদো বা জাড় লাগে। আজকাল অবশ্য এদের বিবাহ অনুষ্ঠানে প্রতিবেশী সমাজের প্রভাব পড়ছে। ফলে

অনেক পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে ।

লেপচা সম্প্রদায় বৌদ্ধ খৃষ্ট ও আদিধর্মে - বিশ্বাসী । এদের মধ্যে এই তিনটি ধর্মীয় সম্প্রদায় দেখা যায় । বৌদ্ধ ধর্ম এদের আদি ধর্ম । অন্য জাতের সংগে বিয়ে হবার কারনে লেপচাদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে ।

আজকাল লেপচারা শিক্ষিত হয়ে অনেকে চাকরী করছে । এরা খুব উৎসবপ্রিয় জাতি । এরা নৃত্যগীতে পটু । এরা- হস্তশিল্পে নিপুন । বহুবিবাহের চল লেপচাদের মধ্যে নেই । এদের মধ্যে বর্নভেদ নেই । স্বগোত্রে বিয়ে হয় না ।

অতীতে লেপচাদের উৎকৃষ্ট সাহিত্য, পুরান ও ধর্ম শাস্ত্র ছিলো । তাছাড়া সিকিম, কালিম্পং, কার্শিয়াং - ইত্যাদি অঞ্চলের স্থান, নদী, পর্বত উপত্যকা ইত্যাদির যে নাম প্রচলিত আছে তার প্রায় বেশীর ভাগই লেপচা নাম । এখানে - কিছু নাম উল্লেখ করা হোলো:—

ক) মহলদি —— বেঁকে যাওয়া নদী

খ) রং নু —— তিস্তার এক নাম, অর্থ সোজাপথে প্রবাহিত নদী

গ) মিরিক —— জংগল পুড়িয়ে ফেলাকে বলা হয় মিরেক

ঘ) পেশক —— জংগল

ঙ) পোক্বং —— পো নামক বাঁশের মহল

চ) সিবক —— সি-ঠান্ডা যাওয়া, বক-সংহত,

লেপচাদের মধ্যে যারা আদিধর্মে বিশ্বাসী, তাদের কাছে 'কিম্‌-চুম্‌ বাও-রু-' বা 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' সবচেয়ে বড় দেবতা। একে এরা আদি পিতাজ্ঞানে পূজা করে। এদের উপাখ্যান অনুসারে 'কাঞ্চনজঙ্ঘার দুটি পুঞ্জ থেকেই নাকি পৃথিবীতে প্রথম দুজন - মানব মানবীর জন্ম হয়েছিল। তাদের বংশধারা থেকেই বর্তমান মানবজাতির সৃষ্টি হয়েছে। পাথরের স্তূপ তৈরী করে ফুল, ফল উৎসর্গ করে এরা 'কাঞ্চনজঙ্ঘার পূজা করে।

'নাম থর' লেপচাদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ। এদের ভাষায় পুরোহিতকে বলে 'বঙ- থিঙ'। স্ত্রী- পুরোহিতকে বলে 'মোন্‌'। 'তাসেথিঙ-বম্‌', 'মিদ্যুপ,' 'মুঙ মাসো মুঙ' প্রভৃতি - অপদেবতার জন্য পুরোহিতের নির্দেশ অনুযায়ী শূয়োর, মুরগী, গরু উৎসর্গ করে পূজা করে।

কর্মফল এবং পরজন্মে এরা খুব বিশ্বাসী। মৃত্যু হলে এরা ঘরের দরজা দিয়ে মৃতদেহ বের করে না। ঘরের মেঝে বা পাটাতন ভেঙে সেখান দিয়ে মৃতদেহ বাইরে বের করে নিয়ে যাবার এক অদ্ভুত প্রথার প্রচলন রয়েছে এই লেপচা সমাজ - ব্যবস্থায়। মৃতদেহ কবর দেবার পর পুরোহিত 'ফীক' বা 'পবিত্র জল' ছিটিয়ে বাসগৃহ শুদ্ধ ও পবিত্র করে।

কাঠ এবং ধাতুর কাজে এরা দক্ষ। ছবি আঁকায় এদের দক্ষতা অতুলনীয়।

১৮৪০ সাল নাগাদ ক্যাম্বেল পশ্চিম ভুটান, পূর্ব নেপাল - ও বর্তমান সিকিম ও দার্জিলিং অঞ্চলে এদের দেখতে পান। লেপচাদের ভাষা, ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি নানা সময়ে নানাভাবে - আক্রান্ত হয়েছে। মেনওয়ারিং নামে একজন বুদ্ধিজীবি লেপচা বলেছেন, " The Lepchas received the final blow from the British people".

(৩) ভুটিয়া :-

দার্জিলিং জেলার গোড়াপত্তনের সময় ১৮৩৫ সাল থেকে ১৮৫২ সাল পর্যন্ত মাল বহনের কাজে পার্বত্য জনগোষ্ঠী বিশেষ করে ভুটিয়ারা এই কাজে নিযুক্ত হয়। ভুটিয়ারা খুব পরিশ্রমী এবং অল্পে তুষ্ট। একজন ভুটিয়া ভারী মাল নিয়ে - মাইলের পর মাইল হেঁটে যেতে পারে।

'ভুটিয়া নামে পরিচিত সম্প্রদায়ের কয়েকটি শাখা আছে। নেপালী ভুটিয়া-রা 'শেরপা' নামে পরিচিত। দার্জিলিং -এর ভুটিয়াদের আর এক সম্প্রদায় এবং লেপ্চা উপজাতি মিশ্রিত -। ভুকপা বা 'ডুকপা' নামে ভুটিয়া সম্প্রদায়ের আর একটি শাখা- রয়েছে। এরা আবার কয়েকটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত এবং এরা - তিব্বতী বৌদ্ধধর্মের 'কারমাপা' শাখা অবলম্বী। আর যে,

তিব্বতীরা দার্জিলিং-এ বসবাস করতো তাদের 'টিবেটান ভুটিয়া' বা 'তিব্বতী ভুটিয়া' বলা হোতো ।

নেপালী ভুটিয়া তিব্বতের আদি মানুষ । ভুটিয়া-রা বৌদ্ধ ধর্মে বিশ্বাসী । তন্ত্রমন্ত্রেও এদের আগ্রহ - রয়েছে । পশুপালন, চাষবাস, ব্যবসা, বানিজ্য এদের জীবিকা ।

ভুটিয়াদের চেহারা লম্বা, স্বাস্থ্য ভালো এদের চেহারায় যোঙ্গলীয় প্রভাব প্রকট ।

ভুটিয়া পুরুষ ও মহিলা উভয়েই 'বাকু' নামে-পোশাক পরে । 'থানজু' নামের পোশাকও এরা ব্যবহার করে । শীত থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্য এরা উল, কাপড় ও চামড়ার সাহায্যে একরকম জুতা তৈরী করে ব্যবহার করে ।

ভুটিয়ারা ভাত, মাংস সবই খায় । মাছ মাংস শুকিয়ে রাখে । অন্যান্য উপজাতিদের মতো এরা নেশা - জাতীয় পানীয় খেতে ভালোবাসে । এরা বাবা, মা, ভাই, বোন সকলে মিলেমিশে একসংগে থাকতে ভালোবাসে । ভুটিয়া মহিলারা তাঁতে খুব সুন্দর কাপড় বোনে ।

সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী উত্তরবংগের উপজাতিদের একটি সারনি এখানে তুলে ধরা হোলো :—

আকৃতি – ৩

উত্তরবংগের উপজাতি

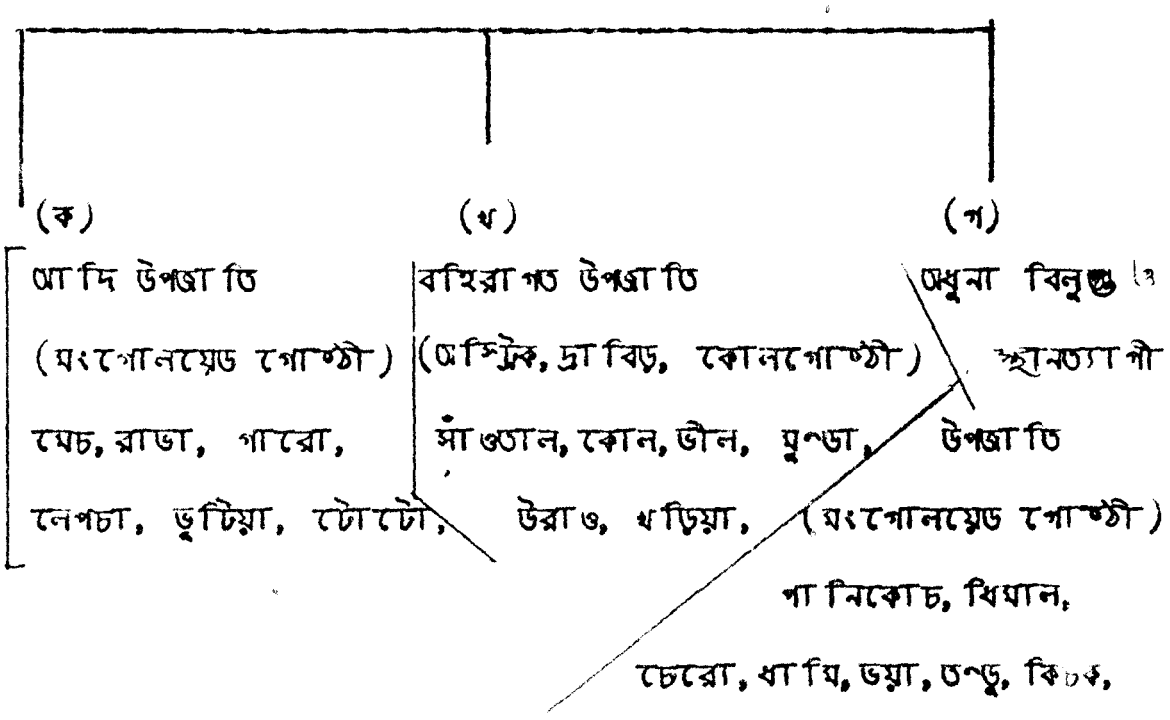

বর্তমানে লেপচা, ভুটিয়া, নাগা, মেচ, রাভা, নেপালী, গারো, কোচ, টোটো উপজাতি ছাড়া অন্যান্য উপজাতি বিলুপ্ত প্রায় ।

(চ) নেপালী :-

উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং জেলায় নেপালীদের বসবাস সবচেয়ে বেশী । তবে উত্তরবঙ্গের সব জায়গাতেই কমবেশী নেপালীদের বসবাস করতে দেখা যায় ।

এদের চেহারায় মোংগলয়েড ছাপ রয়েছে। নেপালীদের মধ্যে লিম্বু, রাই, ছেত্রী, তামাং, শেরপা, থাপা, গুরুং, প্রধান পদবী হিসেবেই জনসমাজে পরিচিত। এরা নেপালীদের বিভিন্ন সম্প্রদায় বলে নিজেদের মনে করে। এদের ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি, চেহারা সবকিছুর মধ্যেই পার্থক্য লক্ষনীয়।

উনবিংশ শতাব্দীর আগে থেকেই ভারতের হিন্দুধর্মের কু প্রথাগুলি নেপালে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। জাতপাতের ভেদাভেদ-এর ফলে নেপালের কিছু সম্প্রদায় অস্পৃশ্য বলে চিহ্নিত হয়। তখন ব্রাহ্মন ও ছেত্রীরাই নেপালের বিভিন্ন শাসনকাজে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন পদগুলি অধিকার করত।

নেপালী ভাষা ইন্দো এরিয়ান ভাষা থেকে এসেছে বলে বিদগ্ধজন মনে করেন। সরকারী, বেসরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে বর্তমানে এদের সংখ্যা যথেষ্ট।

নেপালী ব্রাহ্মন এবং ছেত্রীরা হবিবাহে - বিশ্বাসী বলে ঐ ক্ষেত্রে জাতপাত মানেনা। তাই গুরুং, মগর, তামাং নেওয়ার, শেরপা প্রভৃতি সব সম্প্রদায়ের মেয়েকেই এরা বিয়ে করে।

এরা রাম, বিষ্ণু, কৃষ্ণ, শিব, - এর উপাসক। বর্তমানে দুর্গোৎসব, দীপাবলী সব উৎসবই পালন করে। এরা -

মৃতদেহ দাহ করে। এদের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বিষয়ে হিন্দুদের সংগে মিল পাওয়া যায়।

ছেত্রীরা গোর্খা রেজিমেন্টে সুনামের সংগে কাজ করছে। এরা পুরুষ ও মহিলা সকলেই খুব পরিশ্রমী।

একটি রবীন্দ্র সংগীত নেপালী ভাষায় রূপান্তরিত করে লিপিবদ্ধ করা হোলো:-

বাংলা:-

' সবারে করি আহ্বান —
এসো উৎসুকচিত্ত, এসো আনন্দিত প্রাণ ।।
হৃদয় দেহো পাতি, হেথাকার দিবা রাতি
করুক নবজীবন দান ।।
আকাশে আকাশে ধরে বনে তোমাদের মনে মনে
বিছায়ে বিছায়ে দিবে গান ।
সুন্দরের পাদপীঠতলে যেখানে কল্যাণদীপ জ্বলে
সেথা পাবে স্থান ।। '

(রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর)
'গীতবিতান'

নেপালী ভাষায় —

" সবলাই গরছৌ আহ্বান ।
আও উৎসুকচিত্ত, আও আনন্দিত প্রান ।
হৃদয় অন্তর খোলি, ইয়হা-ইও দিবারাতি
গর্নুন নবজীবন দান ।।
আকাশ-অও পাহাড়্যা বনৈ বনমা,
সবইকো মন-মনমা বিছায়ি বিছায়ি দেও গান ।
সুন্দর তিমরো পাদপীঠতলমা
ইয়হা কল্যান-দীপ জ্বলৈ,
তেহি পাউছো স্থান ।। "

(ছ) রাজবংশী :-

বাংলাদেশ, আসামের কিছু অঞ্চলসহ উত্তরবঙ্গের সব কয়টি জেলার প্রায় সর্বত্রই রাজবংশীরা বসবাস করে । এদের সংগে দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক রক্তের সংমিশ্রন ঘটলেও এদের মোঙ্গলীয় গোষ্ঠীর বলেই মনে করা হয় । কোচ, রাজবংশী, পলিয়াদের একই সম্প্রদায় বলে মনে করা হোতো ।

এদের ভাষা বাংলা। পশ্চিমবঙ্গে এরা 'শিডিউল কাস্ট' হিসেবে পরিচিত । একদা কোচবিহারকে - কেন্দ্র করে উত্তর পূর্ব ভারতে এদের রাজশক্তি একসময়ে বিস্তৃতি -

লাভ করে । কোচ রাজা নরসিংহদেব-এর আমলে রাজ্যসীমা 'ত্রিস্রোত' পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে ।

রাজবংশীরা কৃষক । কৃষিকাজে এরা দক্ষ । উত্তরবঙ্গের উর্বর ও অনাবাদী কৃষি জমিতে আবাদ করে এরা ফসল ফলাতে শুরু করে । এরা কৃষিকাজ ছাড়াও মাছ ধরে । মাছ নানাভাবে শুকিয়ে - রাখে । ধান, পাট, তামাক এদের অর্থকরী ফসল । এদের চাহিদা কম - বলে এরা খুব সাদাসিধে জীবনযাপন করে ।

রাজবংশীরা হিন্দু, কিন্তু তাদের মধ্যে বর্ণহিন্দু বাঙালীদের মতো কু-প্রথা ছিলো না । জলপাই গুড়ি জেলার তরাই অঞ্চলের এবং উত্তর দিনাজপুরে যে, মুসলিম রাজবংশীরা বসবাস করে তাদের চেহারায় পূর্ব বিহারের নীচু সম্প্রদায়ের মানুষের ছাপ লক্ষ্য করাযায় ।

রাজবংশীরা বেশীরভাগই দরিদ্র । তবে যারা ধনী তারা কিছুটা পড়াশোনা করছে । এদের সমাজে পুরোহিত আছে । এরাও দেবদেবী, জন্তু, জানোয়ার, পশু-পাখীর পূজা করে । তিস্তা নদীর বন্যায় প্রত্যেক বছর ক্ষতি হয় বলে এরা 'তিস্তাবুড়ীর পূজা' করে । বাঘের উপদ্রবের জন্য বাঘকে পূজা করে । যাতে ঠিক মতো বৃষ্টি হয় সেজন্য ব্যাঙের পূজা করে । এই পূজার নাম 'হুদুমদেও' ।

রাজবংশীদের সমাজ পিতৃতান্ত্রিক। বর্তমানে এদের মধ্যে লেখাপড়া শিখবার প্রবনতা বাড়ছে। পুরুষ ও মহিলারা চাকরী - করছে। রাজবংশীদের মধ্যে তাঁত বোনার কাজ এখন অনেক কমে গেছে। গ্রামের তাঁতিদের তৈরি 'ফোতা' নামের মোটা ধরনের শাড়ী ব্যবহারে এরা অভ্যস্ত। পাট দিয়ে তৈরী সুতোয় 'ধকরা' বা 'সতরঞ্জ' তৈরী করে। এগুলি রাজবংশীরা 'স্যাজা' নামে বিছানার চাদর এবং গায়ে দেবার 'শেল'-এর মতো ব্যবহার করত। 'ধকরা' আজকাল আর বিশেষ দেখা - যায় না।

'এরন্ড' গাছের ফলের বীচি কলাপাতার ছাই-এ মিশিয়ে গুঁড়ো করে গরম জলে সিদ্ধ করত। ঠান্ডা হলে উপরে তেল ভেসে উঠত। সেই তেল হাত দিয়ে তুলে একটা পাত্রে জমিয়ে রাখত। প্রয়োজনমতো জ্বলতে দিয়ে সেই তেল-এর বাতি জ্বালাতো।

রাজবংশীরা আগে তামাকখেতো। বর্তমানে এরা - বিভিন্ন নেশায় আসক্ত হয়ে উঠছে। এদের চিরাচরিত বেশভূষা, আচার, আচরন, কাজকর্ম বর্তমানে পরিবর্তিত রূপ ধারন করছে।

রাজবংশী সমাজে গাওয়া একটি বিরহসংগীত এখানে তুলে ধরা হোলো:-

আজি নদীর জল ঘন্নোন যাজন, নদীত্ উটে ঢেউ।
মোর নারীর মনেরে আগুন দেইক্‌লো না আর কেউ।।
নদীত্ কান্দে পানকৌড়িরে বনোত কান্দে টিয়া।

ভর যুবতী নারীরে কান্দে পালঙ্কেতে শুতিয়া ।।

হালুয়ার শোবা হাল পেন্টিরে, পেন্দোনের শোবা ধুতি

ভরযুবতী নারীরে শোবা যার সে আছে পতি ।। "

(মালতী রায়|কোচবিহার)

এখানে হালুয়া অর্থে চাষী

হাল-পেন্টিরে—লাঙল-জোয়াল

পেন্দোনের— পরিধান করবার, পরবার ।